জুন ২০২০

কমলবার্তা

কমলবার্তা

জুন ২০২০

সূচীপত্র

২ সম্পাদকীয়
ধিক্কার, চরম ধিক্কার !

৩ ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-র প্রয়াণ দিবস
অভিমন্যু রায়

৭ কংগ্রেস দলের ভারতবর্ষ বিভাজন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান
রামপ্রসাদ ঘোষ

১৪ এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে হবে: অমিত শাহ

১৭ একটি টুইট, একটি রাজনৈতিক দল এবং কিছু বিতর্ক
বিমল শংকর নন্দ

১৯ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি
সুমন কর্মকার

২১ মমতাময়ীর পুলিশ
দীপ্তাশ্য যশ

২৩ পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনা তত্ত্ব রাজনীতির কৌশল মাত্র
রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী

দিলীপ ঘোষ কর্তৃক ৬ নং মুরলী ধর সেন লেন,
কলকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত,
সম্পাদক **দিলীপ ঘোষ,**
কার্যকরী সম্পাদক **প্রণয় রায়**
Phone: 2241 0281, Fax: 2241 7460
e-mail: bjpbengalpublication@gmail.com
Website: www.bjpbengal.org

সম্পাদকীয়

ধিক্কার, চরম ধিক্কার !

গড়িয়া শ্মশানে অন্ত্যেষ্টির জন্য আনা হয়েছিল ১৩ টা লাশ। পচে মাংস খুলে গেছে, মুখের মাংস গলে দাঁতপাটি বেড়িয়ে গেছে ,বুবুক্ষু কুকুর এদিক ওদিক করছে আর ভাবছে, যদি কোনমতে ছিটকে পড়ে একতাল মাংস বা হাড়ের টুকরো—ওহ কতদিন আয়েশ করে খাওয়া যাবে মানুষের মাংস। বুকে হুক লাগিয়ে কি অসাধারণ দক্ষতায় বডি টেনে নিয়ে তোলা হল গাড়ির ডালায়—কি মসৃণ এক চিত্রনাট্য। না কোন সাজানো গল্প নয়, ডামি নয়, রারাবের পুতুল নয়, ট্রেনড কুকুরও নয়। বিনি পয়সার মহার্ঘ ছবি।

সারা বিশ্বের মানুষ দেখলো এক মহার্ঘ ছবি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় যে সরকার এবং পৌরসভা চলছে তাদেরই তৈরী চিত্রনাট্য।

রুচিশীল, কৃষ্টিময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, কি দেখলেন? জানি, বলতে পারবেন না। ছবিটা দেখেই গুলিয়ে গেছে গা, বমি করে ফেলেছেন অনেকেই।

এটা আজকের মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই মাননীয় রাজ্যপাল যখন বলেন—"যদি এরা আপনার আত্মীয় হত", তখন সত্যিই লজ্জায় মাথা মাটিতে মিশে যায়,ভাবতে হয় আমরা কোন বর্বরদের হাতে পশ্চিমবঙ্গকে তুলে দিয়েছি যারা নুন্যতম মানুষের মৃতদেহকে সম্মান জানানোর শিক্ষাটাও লাভ করে নি?

১৩ লাশের অন্ত্যেষ্টিপর্বে পশ্চিমবঙ্গের রুচির, বিবেকের, সহানুভুতির অন্ত্যেষ্টি করে দিলেন মমতা ব্যানার্জী আর ফিরহাদ হাকিমেরা। মনে হচ্ছিল অতীতের নরখাদকের পৈশাচিক অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস দুর্গন্ধে ভরে গেল, যেন তাদের ব্যঙ্গোক্তি কানে এল—'এরই নাম সভ্যতা'!

ধিক্কার, চরম ধিক্কার! অপদার্থতায় তলিয়ে যাওয়া এই মমতা সরকারকে ধিক্কার।

আর এই সরকারের কাছ থেকে কোন মানবিকতা,সুবিচার আশা করা অন্যায়। হাসপাতালে রুগীদের জঘন্য কোয়ারেণ্টাইন, লকডাউনে ক্ষুধার্থের মুখের খাবার, আমফানে ঘর উজাড় হওয়া মানুষের ত্রিপল—সরকারী সাহায্যের টাকা লুঠ; পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো নিয়ে ধর্মের বিচার, ১০০ দিনের কাজের টাকা আত্মসাতের হাজার কাহিনী—বর্বরদেরও লজ্জিত করছে।

ফিরে এল সেই ১৩ লাশ! বামফ্রণ্টের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাতে গিয়ে ১৩ লাশই আপনাদের খ্যাতির শীর্ষে এনেছিল, আর আজ ওই ১৩ লাশই আপনাদের সরকারের অন্ত্যেষ্টির নিমন্ত্রণ কার্ড পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল।

২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-র প্রয়াণ দিবস

অভিমন্যু রায়

১৯৫৩ এর ৯ মে শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাঞ্জাবের আম্বালার মাঠে এক বিরাট জনসভায় পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর কাশ্মীর নীতিকে তুলোধোনা করলেন। যদি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে কাশ্মীরের কেন আলাদা সংবিধান, আলাদা নিশান, আলাদা উজিরি আজম (প্রধানমন্ত্রী), আলাদা সুপমিকোর্ট হবে তার ব্যাখা চাইলেন নেহেরুর কাছে।

ওই দিনই জলন্ধরের ১৫ কিমি দূরে তিনি ফাগোয়ারাতে আর একটি জনসভায় শেখ আবদুল্লার এটিটিউড নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, "শেখ আবদুল্লা আমাকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু আমি বিনা পারমিটেই কাশ্মীরে ঢুকব।" পরের দিন তিনি পাঞ্জাবেই রইলেন কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য।

১১মে ১৯৫৩ বিকাল ৪ টায় ডঃ মুখার্জির জিপ কাশ্মীর -পাঞ্জাব সীমান্তের দিকে রওনা হল। সঙ্গে ডঃ মুখার্জির প্রাইভেট

সেক্রেটারি টেকচাঁদ ঠাকুর, জনসঙ্ঘ নেতা শ্রী গুরু দত্ত বৈদ এবং ডঃ মুখার্জির বিশেষ প্রতিনিধি অতি বিশ্বস্ত যুবক শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী।

ঠিক বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে মাধোপুর চেকপোস্ট পার হয়ে জম্মু সীমান্তের ভিতরে রাভী নদীর সেতু অর্ধেক পার হওয়ার পরেই সেতুর উপরে জম্মুর কাঠুয়া থানার পুলিশ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কনভয় থামিয়ে দিলেন। এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাতে একটা নির্দেশ নামা ধরিয়ে দিলেন যাতে লেখা আছে -ডঃ মুখার্জির জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই।

তখন ডঃ মুখার্জি তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুগামী যুবক অটল বিহারী বাজপেয়ীকে জিপ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন, "বাজেপেয়ী তুমি ফিরে যাও, গিয়ে দেশবাসীকে বলো, আমি বিনা পারমিটেই জম্মু কাশ্মীরে প্রবেশ করেছি।"

এর পরে সেই রাতে তাদের শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হল। পরে শ্রীনগর শহর থেকে ৭ মাইল দূরে জঙ্গলে ঘেরা সাপ প্যাঁচায় পরিপূর্ণ অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত কুঠুরিতে তাঁদের রাখা হল। চারিপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। যেন এক ভিন্ন গ্রহ। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে যাওয়ায় ডঃ মুখার্জি অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত ঐ কটেজের মেঝেতে শুধুমাত্র একটা তাকিয়া পাতা ছিল। ঐ রাতে ভারতের অন্যতম চিরশ্রেষ্ঠ সন্তান বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জির বীর পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কাশ্মীরের ঠান্ডা সইতে না পেরে — বারে বারে একটা গরম পোষাক ভিক্ষে চাইলেন শেখ আব্দুল্লার কর্চারীদের কাছে। অসহায় বাগানের মালী ফ্যাল ফ্যাল করে উনার দিকে তাকিয়ে থাকল। কারন তাঁর কিছু করার ছিল না। উপরতলা থেকে সেই রকমি নির্দেশ নাকি দেওয়া হয়েছিল।

পরে রাত গভীর হলে কাশ্মীর সরকারের উর্ধতন কর্মচারী বক্সি গুলাম মহম্মদ একটা ওভারকোট আর ব্ল্যাঙ্কেট পাঠালেন ডঃ মুখার্জির জন্য। টিম টিম করা আলোয় ডঃ মুখার্জি আর তাঁর সহযোগীরা ঐ জঙ্গলে হিমাঙ্কের নিচে চলে যাওয়া তাপমাত্রায় মেঝেতে পড়ে রইলেন। ঐ সময় জহরলাল নেহেরু তাঁর দিল্লির বাসভবনে এসি চালিয়ে এবং শেখ আবদুল্লা তাঁর শ্রীনগরের বাসভবনে লেপের তলায় আরাম করতে লাগলেন।

এদিকে দিল্লিতে ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১২ মে ১৯৫৩, হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেন্ট নির্মল চন্দ্র চাট্যার্জি (সিপিএম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জির পিতা) হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারি ভি জি দেশপান্ডে, সংসদ সদস্য শ্রী নন্দলাল শর্মা , ডঃ প্রকাশ বীর শাস্ত্রী সংসদের দেওয়ান হলে ডঃ মুখার্জির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জহরলাল নেহেরু আর শেখ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

১৫ মে ১৯৫৩ জহরলাল নেহেরুর নির্দেশে তাঁদের সকলকেই দিল্লিতে প্রিভেনশন ডিটেনশন এক্ট (P.D.A) এ গ্রেপ্তার করা হল।

২৩মে ১৯৫৩ শনিবার ভোরে জহরলাল নেহেরু তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতকে নিয়ে তিন দিনের সফরে কাশ্মীরে এলেন সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্র ও রাজ্য বিষয়ক মন্ত্রী কে.এন.কাটজু। শ্রীনগর এয়ারপোর্টে তাদের হাসি হাসি মুখে রিসিভ করলেন শেখ আবদুল্লা, করন সিংহ, কাশ্মীরের মন্ত্রী পারিষদরা ও ইন্ডিয়ান আর্মীর টপ অফিসিয়ালরা।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাল লেকের ধারে পন্ডিত নেহেরু হাসি হাসি মুখে এক বিরাট জনতার সামনে আলো জ্বালিয়ে এক পার্কের উদ্বোধন করলেন। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও নেহেরু একটিবারও ডঃ মুখার্জির খোঁজ খবর নিলেন না।

২৪ মে ১৯৫৩ অর্থাৎ পরের দিন রবিবার সকালে পন্ডিত নেহেরু, হোম মিনিস্টার কে.এন.কাটজু, কাশ্মীরের প্রধান শেখ আবদুল্লা, ন্যাশানাল কনফারেন্সের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এক গোপন মিটিঙে মিলিত হলেন। বস্তুত ঐ মিটিংএ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে কিভাবে স্লো পয়জন দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায় সেটা ঠিক করা হল।

পন্ডিত নেহেরু সকল রকম ব্লু প্রিন্ট তৈরী করে দিয়ে ২৪মে সারা দিন ডাল লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করে বোন বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতকে নিয়ে পরের দিন ২৫ মে দিল্লি ফিরে এলেন।

২৬ মে ১৯৫৩ তারিখে Hindustan Standard পত্রিকায় লেখা হল, "ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর তাঁর সহযোগী বন্দীদের কোর্টে এপিয়ার করার অনুমতি দেওয়া হল না। তাঁদেরকে বিনা পারমিটে কাশ্মীরে প্রবেশের দায়ে দুই মাস কারাবন্দী করে রাখা হল।"

নেহেরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাশ্মীরে অসহনীয় পরিস্থিতিতে পড়ে রইলেন ভারত মাতার অন্যতম বীর সন্তান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ও মৌন থেকে গেলেন।

সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়ার এডভোকেট ইউ.এম.ত্রিবেদী ১৩ জুন দেখা করলেন ডঃ মুখার্জির সঙ্গে লিগ্যাল এডভাইস দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঠিক তার পরের দিনই অর্থাত ১৪ জুন এডভোকেট ত্রিবেদী দিল্লি এসে প্রেস কনফারেন্স করে জানালেন যে- "আমি কোনো রকম লিগ্যাল এডভাইস দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে দিল্লি চলে এসেছি কারন — ভারত সরকার আর কাশ্মীর সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে কাশ্মীরের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ আমাদের আলোচনার সময় সব সময় উপস্থিত থাকবেন এটাই নাকি উনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বললেন, "I could not agree to it because under the law talk between the lawyer and his client is confidential."

(ডঃ মুখার্জির সহযোগী মাধক বলরাজের লিখিত বই I Bid

— পৃষ্ঠা নং ২৭৮ এ পরিষ্কার উল্লেখ আছে এই সব কথা।)

মিঃ ত্রিবেদী যখন কাশ্মীর থেকে দিল্লি ফিরে আসছিলেন তখন হোটেলে এক সিনিয়ার কাশ্মীরী নাগরিক উনাকে বললেন — "আপনি এখনই দিল্লি যাবেন না, ডঃ মুখার্জকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান নতুবা উনাকে মেরে ফেলা হবে এখানে।"

সেই একই প্রবীন কাশ্মীরী ব্যক্তি ২৪ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর পরে, ২৪ জুন সকাল বেলা এডভোকেট ইউ.এম.ত্রিবেদীকে মনে করিয়ে দিলেন সেই দশ দিন আগে বলা কথাটা।

পরিকল্পনা মাফিক সম্পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে পন্ডিত নেহেরু ১৯৫৩ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউরোপের লন্ডন, জেনিভার দিকে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হলেন। এদিকে তাঁর নির্দেশ মতন ছক অনুসারে সমস্ত কিছু চলতে লাগল।

এক দম ছক কষে ২৩ জুন ১৯৫৩ তারিখে ডঃ মুখার্জির ক্যালকুলেটেড মার্ডারের ঠিক এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৩০ জুন পন্ডিত নেহেরু বিদেশ সফর শেষ করে ভারতে ফিরে আসেন।

ঠিক সেই দিনই জহরলাল নেহেরু দিল্লি ফিরে এসে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর প্যাডে শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মাতা যোগমায়া দেবীকে একটি চিঠি লিখলেন —

Letter No৬ , 499 , P.M

New Delhi,

June 30, 1953

My Dear Mrs. Mukharjee,

It was with deep grief that I learnt a few days ago,as I was leaving Geneva for Cairo–that your son Dr. Shyamaprasad Mukharjee had died.

The news came as shock to me for, though we may have differed in politics.

When I went to Kashmir about five weeks ago, I inquired as to where he was kept and about his health.

I suppose It was beyond human power to do anything and we have to bow to circumstances beyond control.

If I can be of any service to you, you will please not hesitate to inform me.

Yours faithfully –

S/D Jawharlal Neheru !!!

আর এই এখানেই খটকা —

"Though we may have differed in politics" !!! - আচ্ছা কারোও সঙ্গে যদি রাজনৈতিক মত পার্থক্য থেকেও থাকে তাহলে কি তাকে এইভাবে মেরে ফেলতে হবে ???

"I suppose it was beyond human power to do anything " — " আমি মনে করি এটা ছিল মনুষ্য শক্তির উর্ধে তাতে কিছু করার ছিল না " সত্যি চমৎকার।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বারন করা সত্বেও শ্রীনগর সাব জেলের ডাক্তার ২০ জুন ১৯৫৩, দুপুর ২.৩০টায় জোর করে স্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন দিলেন। ডঃ মুখার্জির পারিবারিক ডাক্তার এই ইঞ্জেকশন সম্পর্কে সতর্ক করে ছিলেন।

ডঃ মুখার্জির প্রাইভেট সেক্রেটারি টেকচাঁদ ঠাকুর ও জনসঙ্ঘের লিডার গুরু দত্ত বৈদকে শ্রীনগর সাবজেলে স্থানান্তরিত করা হল। বিনা শীতবস্ত্রে, বিনা চিকিৎসায় ডঃ মুখার্জি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯ জুন এবং ২০ জুন ১৯৫৩-এর মাঝের রাতটা ভয়ংকর গেল।

ডঃ মুখার্জির পিঠে অসহ্য ব্যথা হতে লাগল এবং প্রচন্ড জ্বর এলো। ২০ জুন সকাল ১১.৩০টায় জেলের ডাক্তার আলী মহম্মদ ডঃ মুখার্জিকে দেখে বললেন—"ডঃ মুখার্জির ড্রাই প্লুরিসি (Pleurisy) হয়েছে। তাই উনাকে স্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং কিছু পাউডার জাতীয় ঔষধ খাওয়াতে হবে।"

এর পূর্বে ১৯৩৭ ও ১৯৪৪ সালে ডঃ মুখার্জি ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। সেইজন্য সত্বর ডঃ মুখার্জি বললেন— "আমাদের পারিবারিক ডাক্তার মিঃ বোস বলেছেন স্টেপটোমাইসিন আমার শরীরে সুট করে না। তাই ওটা কিছুতেই দেওয়া যাবে না।"

কিন্তু এই কথা শোনার পরেও ২০ জুন দুপুর ২.৩০টায় এক গ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন ডঃ মুখার্জির হাতে পুশ করা হলো এবং ২১ জুন সকাল ১০টায় আরও এক গ্রাম ঐ একই ইঞ্জেকশন ডঃ মুখার্জিকে পুশ করা হল। তাকে আশ্বস্ত করা হল এই বলে যে, এটা নূতন ড্রাগ, এটা নিলে উনি দ্রুত সেরে উঠবেন।

২১ জুন বিকেল ৪টা থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জর বুকে ও পিঠে ব্যথা অসহ্য ভাবে বেড়ে গেল, জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেল।

বিনা চিকিৎসায় মাত্র দুই জন সহযোগী বন্দীর সঙ্গে সেই রাতে পড়ে রইলেন ভারতমাতার বীর সন্তান পশ্চিম বাংলা সৃষ্টির জনক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

২২ জুন ডঃ মুখার্জির প্রচন্ড বুকে ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট হতে লাগল ভোর ৪টেতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোর ৪.৪৫টা পর্যন্ত তিনি পড়ে রইলেন প্রায় অচেতনভাবে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবেগ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলো।

উপায় না দেখে তাঁর সহযোগী বন্দী গুরু দত্ত বৈদ এবং টেকচাঁদ ঠাকুর একটু গরম জল করে তাতে একটু দারুচিনি আর লবঙ্গ মিশিয়ে ডঃ মুখার্জিকে পান করালেন। ভোর ৫টায় তিনি সামান্য সুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

ঐদিন সকাল ৭.৩০টায় শেখ আব্দুল্লার ঠিক করা ডাক্তার আলী মহম্মদ তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডঃ মুখার্জির বাম হাতে ২ সি.সি কোরামিন ইঞ্জেকশন দিলেন।

এর পরেই ডঃ মুখার্জিকে বলা হলো — "উপর মহলের নির্দেশ আছে আপনাকে হসপিটালে ভর্তি করাতে হবে তাই এখান থেকে রিমুভ করা হচ্ছে।"

২২ জুন ঠিক দুপুর ১২টায় ভয়ংকর অসুস্থ বাংলার বাঘ ডঃ আশুতোষ মুখার্জির বীর পুত্র শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অসহায়ের মতন শুধু মাত্র একটা জামা পরে কোনো রকম শীত বস্ত্র না পরে ফ্যাল ফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে শেখ আব্দুল্লার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে হেঁটে গাড়ি নং — কে — ১৫৯ এ গিয়ে উঠলেন সাধারণ ক্রিমিনালদের মতন।

হাসপাতালে ভর্তি করার পর জানানো হয় যে তার Heart Attack হয়েছে। এর একদিন পর তার মৃত্যু হয় রহস্যজনক ভাবে। ২৩ জুন ৩.৪০টায় তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। ডঃ মুখার্জির কোনও পোস্ট মর্টেম করা হয়নি বা মৃত্যুর কোনও তদন্ত হয়নি। যোগমায়া দেবী নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করলে নেহেরু তা প্রত্যাখান করেন।

S.C DAS এর মতে, হাসপাতালের নার্স RAJDULARI TIKU শ্যামাপ্রসাদের মেয়ে সবিতাকে বলেছিলেন যে ডঃ মুখার্জি ডাক্তারের জন্য চিৎকার করলে সে DR JAGANNATH ZUTSHI কে ডেকে আনে। তিনি একটি বিষাক্ত পাওডার দিলে ডঃ মুখার্জি প্রচন্ড চিৎকার করতে শুরু করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান। ২০০৪ সালে বাজপেয়ী দাবি করেন যে মুখার্জির গ্রেপ্তার ছিল "নেহেরুর ষড়যন্ত্র।"

এমনকি তার মৃত্যুর পরও অনেক ষড়যন্ত্র হয়। কলকাতাতে তার মৃতদেহ যেদিন আনা হয় সেইদিন বামেরা বাংলা বন্ধ ডেকেছিল যাতে তার অন্তেষ্টিতে বেশী মানুষ যেতে না পারে। তথাপি হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য।

স্বাধীনতার ৭৩ বছরে এই মহাপুরুষকে কম অবহেলার স্বীকার হতে হয়নি। তথাপি তিনি বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান দখল করে আছেন।

[সৌজন্যে-ওয়ান ইন্ডিয়া ডট কম]

কংগ্রেস দলের ভারতবর্ষ বিভাজন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান

রামপ্রসাদ ঘোষ

গত বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদি আন্দোলনের সাথে সাথে শুরু হয় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সশস্ত্রবিপ্লব। এই বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ অথবা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তিকালে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রথম জন নেতাজীসুভাষ চন্দ্র বোস এবং অপর জন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

১৯৩০ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর দায়িত্ব গ্রহণ, ১৯৩৫ সালে বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক হিসেবে বরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার দীক্ষান্ত ভাষণ, সর্বাত্মক সংস্কারের মাধ্যমে পরবর্তি মাত্র চার বছরের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া, সবই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের এক কণিকা মাত্র।

১৯৩৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর সাথে বৃটিশ সরকারের চুক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে, বৃটিশ সরকার এক নতুন সংবিধান ঘোষণা করে। এই নতুন সংবিধানে ভারত শাসনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা বৃটিশ রাজ প্রতিনিধিদের হাতে রেখে রাজা-মহারাজা এবং মুসলমান ধর্মালম্বীদের পৃথক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা বলা হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এই ব্যবস্থা মেনে নেয় সানন্দে। কিন্তু প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন সুভাষ চন্দ্র বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মানবেন্দ্র নাথ রায় সহ প্রগতিশীল নেতৃত্ব।

সুভাষ চন্দ্র বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ নবীন নেতৃত্বের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করল এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সম্পূর্ণ হল। ভারতীয় মুসলীম লীগ এবং মহম্মদ আলী জিন্না তাদের পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পেল। মজার কথা এই বিভাজন সত্ত্বেও মুসলীম লীগ সারা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হল না। নির্বাচনে কংগ্রেস পেল ৭০৭টি আসন। মুসলীম লীগ পেল ১০৬টি আসন। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট পার্টি পেল ১০১টা আসন, বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পেল ৩৬টা আসন এবং নির্দ্দলরা পেল ১০টা আসন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরও মুসলীম লীগ ভারতবর্ষের সকল মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিল না। বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, পাঞ্জাবের সিকন্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফর খান একযোগে মুসলমান ভোটে থাবা বসায়। কিন্তু এই সকল মুসলমান দলগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে ভারতীয় মুসলীম লীগকে দুর্বল করার মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা তখন কংগ্রেস দলের ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখন থেকে ধীরে ধীরে কেবলমাত্র অমুসলীম হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের দলে পর্যবসিত হল, যদিও অমুসলীম বিশেষ করে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের কোনরূপ উদ্যোগ বা উৎসাহ ছিল না। এর মাত্র ১০ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশকে কংগ্রেস মুসলীম লীগের হাতে তুলে দিল।

অখণ্ড বাংলায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ৫৪টি আসন। মুসলীম লীগ ৩৭ আসন, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬ আসন এবং নির্দ্দলরা পায় ১০টা আসন, ৫৪টি আসন পেলেও কংগ্রেস গরিষ্ঠতার চেয়ে কম আসন থাকায় দায়িত্ব নিতে

চায় না এবং নিরপেক্ষ বিরোধি থাকতে চায়। ফজলুল হক তার ৩৬ আসনের সাথে নির্দ্দল ১০টা আসন যুক্ত করে কংগ্রেসের সমর্থন প্রার্থনা করে, যাতে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগকে এক ঘরে করা যায়। কিন্তু কংগ্রেস রাজী হয় না, তখন বাধ্য হয়ে ফজলুল হক মুসলীম লীগের সমর্থনে মন্ত্রী সভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন (তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ফজলুল হক।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন একাই ভারতীয় হিন্দুদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা করে চললেন। এই অবস্থায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সারা ভারত হিন্দু মহাসভার নেতা, আন্দামান সেলুলার জেল ফেরত বিপ্লবী, বিনায়ক দামোদর সাভারকার কলকাতায় আসেন এবং সারা ভারতবর্ষে ক্রম হ্রাসমান হিন্দু আধিবত্যের বিষয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বীর সাভারকরের উৎসাহে এবং সারা ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান মুসলমান সাম্প্রাদায়িকতাকে রোখার উদ্দেশ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় কার্যকরি সভাপতি এবং বাংলাপ্রদেশের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তার ডাইরীতে লেখেন যে, তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট ওপুষ্ট রাজনৈতিক আবর্তই তাকে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার রাজনীতিতে টেনে আনে।

১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ মুসলীম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করে। অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যার বিচারে মুসলমান অধিক থাকায় মুসলীম লীগকে প্রতিহত করতে হিন্দু মহাসভা ফজলুল হকের সাথে যুক্ত হয় এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। এই মন্ত্রীসভা ''শ্যামা-হাক মন্ত্রীসভা'' বলে খ্যাত। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরামর্শে ফজলুল হক মুসলীম লীগের হাত ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরতে অগ্রসর হন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে হিন্দু মহাসভার সর্ব্বোচ্চ নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাঁরও নেতা। ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অবিভক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০ নভেম্বর ১৯৪২ অবধি এই দায়িত্বে থাকেন।

এই সময় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর্থিক অনটনের কারণে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের শরণাপন্ন হন, কিন্তু কোনরূপ ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে যোগাযোগ করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তৎকালীন বিহারের মধুপুরে তার পৈত্রিক গৃহে সপরিবারে কবির থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং কবির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ই জুলাই ১৯৪২ মধুপুর থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন ''..... এই Coalition Ministry র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি আর কাউকে নয়। আমি জানি আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বাবুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের পতাকার নায়ক — কাজী নজরুল ইসলাম।''

১৯৪২ সালের স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ধৃত বন্দীদের ওপর দমন পীড়নের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ২৪ এপ্রিল ১৯৪৩ বাংলার গভর্নর জন হার্বাট ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বাতিল করে মুসলীম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হন হাসান সোরাবর্দ্দি। এই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে সারা বাংলায় ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করা হয়।

সারা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দুর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে হিন্দু মহাসভার সর্ব্বোচ্চ নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মাত্র ২০ শতাংশ মুসলমান ধর্ম্মালম্বীদের বিভেদের রাজনীতির বিপদ সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে ছুটে বেড়ালেন আসমুদ্র হিমাচল। একমাত্র তিনি বুঝেছিলেন, সারা ভারতবর্ষের অমুসলমান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে একজোট করলেই মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভাজন আটকান সম্ভব। মজার কথা, সারা ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ বৃহত্তর অমুসলমান জনগোষ্ঠি ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন কংগ্রেস দলকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে গ্রহণ করলেও কংগ্রেস তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়। সুভাষ চন্দ্র বোস তখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। প্রয়োজনে অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভাজন মেনে নিয়েও যেন তেন প্রকারেণ শাসন ক্ষমতা দখলই তখন কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস তখন আন্দোলন বিমুখ ক্ষমতালোভি। মানসিক ভাবে মুসলীম লীগের কাছে নতি স্বীকার করে ভারতবর্ষের বিভাজন মেনে নিলেও কংগ্রেস প্রকাশ্যে স্বীকার করতে ভীত ছিল মূলত হিন্দু মহাসভার সর্ব্বোচ্চ নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর তীব্র বিরোধিতার জন্য।

মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকৎ আলি, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তখন মানসিকভাবে কাছাকাছি। সারা ভারতবর্ষ নিশ্চুপ আসন্ন সাইক্লোনের অপেক্ষায়, মুসলীম লীগ মসজিদ ও মাদ্রাসা মারফৎ তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত। মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন আগে মুসলমান পরে ভারতীয় এই প্রচারে মগ্ন, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কারা ঘোষণা করবে অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভাজনের সিদ্ধান্ত?

ইতিমধ্যে মুসলীম লীগের সর্ব্বোচ্চ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার যক্ষারোগ ধরা পড়েছে। ডাক্তাররা বললেন আয়ু মেরে কেটে আর দু-বছর। অবিলম্বে প্রকাশ্যে পাকিস্তান ঘোষণার দাবীতে জিন্না ঘোষণা করলেন ''ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে''। দিন স্থির হল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট। কংগ্রেস দলের কোন হেলদোল নেই। নেই কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ। গণ আন্দোলন থেকে কংগ্রেস তখন অনেক দূরে, আসন্ন ক্ষমতা দখলের আশায় অপেক্ষমান।

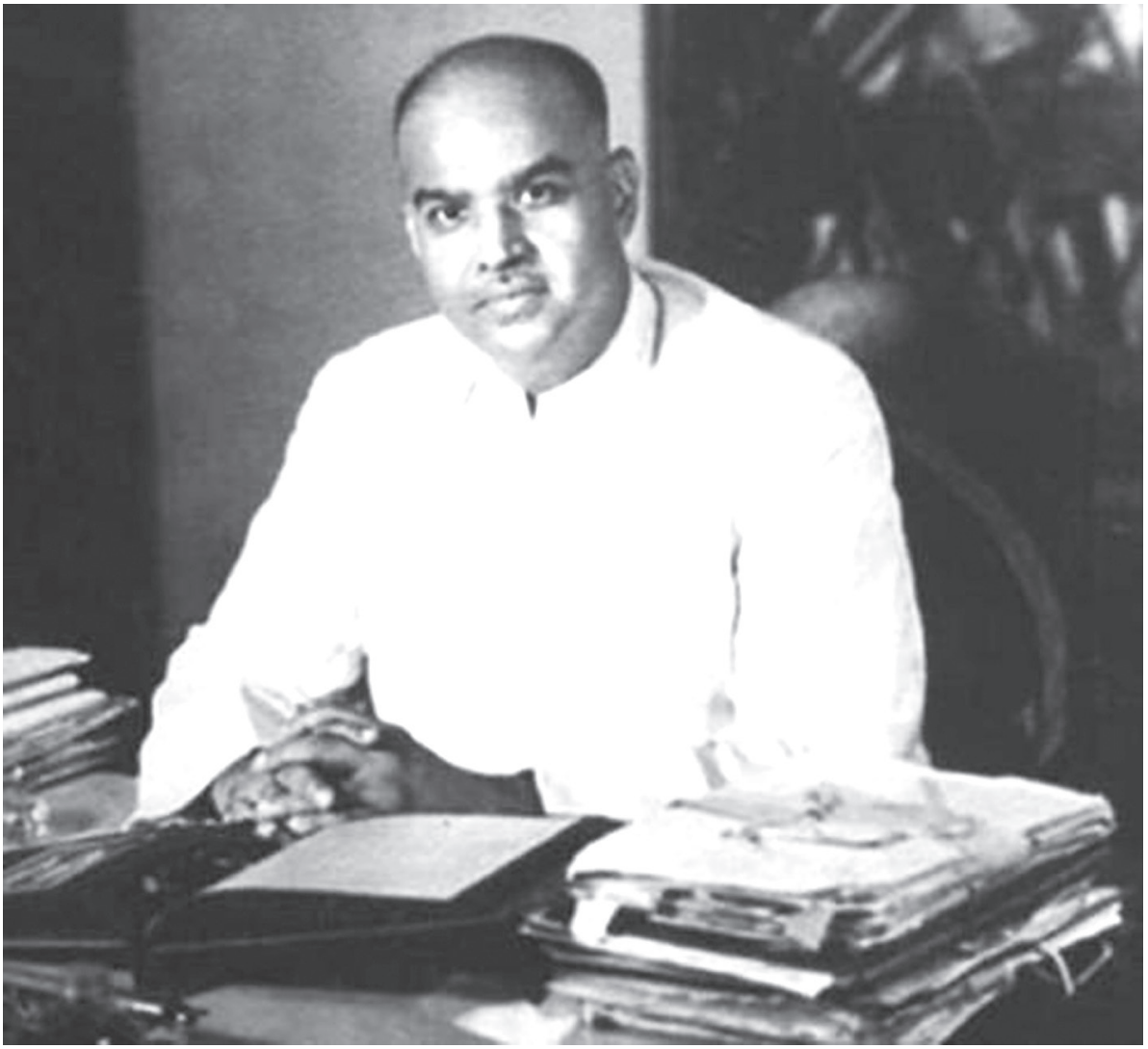

এই ''ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'' র জন্য গোপনে বেছে নেওয়া হল আমাদের এই কলকাতা শহরকে। অখণ্ড বাংলার মুসলমান ৫৪ু এবং হিন্দু ৪৪ু। মুসলীম লীগের আশা সমগ্র বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তান এবং কলকাতা হবে রাজধানী। ১৬ আগষ্ট ভোর থেকে পার্ক সার্কাস, রাজারাজার অঞ্চলে শুরু হল নির্বিচারে হিন্দুদের গৃহে অগ্নি সংযোগ, হিন্দু পুরুষ, শিশু হত্যা, হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্ষণ এবং লুঠ। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এ তখন মুসলমান প্রধানমন্ত্রী, লালবাজারে মুসলমান পুলিশ কমিশনার। প্রশাসন ও পুলিশ থাকল নির্বিকার, বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী ফোর্ট উইলিয়ামে তখন বিশ্রামরত, কংগ্রেসসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোন সাড়া শব্দ নেই, এই একতরফা হিন্দু নর-নারীর হত্যালীলাকে ঐতিহাসিকরা ''দি গ্রেট ক্যলকাটা কিলিং'' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

একই বছর ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে বাংলার নোয়াখালি জেলার মাত্র ১৮ু সংখ্যালঘু লক্ষ্মীপূজোয় রত হিন্দুদের গৃহে গৃহে নেমে আসে বিভীষিকা। শুরু হয় সংঘবদ্ধ মুসলমান আক্রমণ। এক নাগাড়ে হিন্দু গণহত্যা লুঠ, অগ্নি সংযোগ, হিন্দু নারীদের ওপর গনধর্ষণ, হিন্দু মহিলাদের অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, জোর করে গো-মাংস ভক্ষণ করানো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। এক নাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে এই নারকীয় হত্যা ও ধর্ষণলীলা। নোয়াখালির সাথে অবশিষ্ট বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। হাসান সোরাবর্দ্দির বাংলা সরকার দূর থেকে মজা দেখতে থাকে। বৃটিশ সরকার তখন ফিরে যাওয়ার জন্য বাক্স প্যাটরা গোছাতে ব্যস্ত। কংগ্রেস দল নির্বিকার, আসন্ন ক্ষমতালাভের স্বপ্নে বিভোর।

মুসলীম লীগের এই সংঘবদ্ধ নারকীয় অত্যাচারের কোন সক্রিয় প্রতিবাদ কংগ্রেস দলের মধ্যে দেখা গেল না। বরং এই সুযোগে তারা রাজী হয়ে গেল ভারতবর্ষের বিভাজনে। স্থির হল ভারতীয় মুসলমানদের বসবাসের জন্য পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও বাংলা প্রদেশকে নিয়ে গঠন করা হবে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ হবে ভারতীয় হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের বাসস্থান।

ইতিমধ্যে বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফজলুল হক, হাসান সোরাবর্দ্দি, আবুল হাফিস সহ বঙ্গীয় আইন সভার ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন হিন্দু সদস্য স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। মজার কথা, কংগ্রেসের জওহরলাল নেহরু এবং মুসলীম লীগের মহম্মদ আলী জিন্নার এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি ছিল না। জওহরলাল নেহরু অখণ্ড বাংলাকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি। কারণ বাংলা ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বৃহত্তম প্রদেশ। অখণ্ড বাংলা ভারত ভুক্ত হলে বাংলার সর্বমোট লোকসভা আসন হত কমবেশী ১৭০। ফলে সহজেই বলা যায় যে, বাংলার নেতাই নির্বাচিত হতেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী (ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী)। মহম্মদ আলি জিন্না চেয়েছিলেন যে, অখণ্ড বাংলা স্বাধীন হলে পরবর্তিকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে। কিন্তু বেঁকে বসলেন হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। রুখে দাঁড়ালেন এই যৌথ চক্রান্তের বিরুদ্ধে। সঙ্গে পেলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, ভাষাবিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সহ বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একটাই কথা, সারা ভারতবর্ষের শতকরা ২০ু মুসলমান যদি ৮০ু হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করতে না পারে তাহলে বাংলার ৪৪ু হিন্দু ৫৪ু মুসলমানের সাথে একত্রে বসবাস করবে কীভাবে? ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দাবী, যদি ভারতবর্ষের বিভাজন মানতে হয় তাহলে রাজ্য ভিত্তিক নয়, জেলাভিত্তিক বিভাজন চাই। যদি অখণ্ড বাংলাকে ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত রাখা সম্ভব না হয় তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত রাখতে হবে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন কলকাতা আইনসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঐতিহাসিক ভাষণ "If 25% muslims could not agree to live in India, how could 44% Hindu live in Bengal under 54% Muslims". পরিস্থিতি অনুধাবন করে কলকাতার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও ভিটে মাটি বিচ্ছেদের ভয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে আঁকড়ে ধরলেন। তৈরী হল এক নতুন প্রদেশ কেবলমাত্র হিন্দু বাঙালীর পিতৃভূমি ''পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)''। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম না হলে আজ বাঙালী হিন্দুদের শেষ আশ্রয়টুকুও চলে যেত। হিন্দু বাঙালীকে পরবর্তি হাজার বছর ইহুদিদের মত যাযাবর হিসেবে দিনপাত করতে হত। শুধু পূর্ব বাংলা নয়. সমগ্র বাংলা থেকেই বিতাড়িত হিন্দু বাঙালিদের আশ্রয় নিতে হত বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ অবশিষ্ট ভারতবর্ষে। বাঙালী হিন্দুদের নিজস্ব কোন পিতৃভূমি থাকত না। বর্তমান পশ্চিম বাঙলার হাজার হাজার হিন্দু মন্দির স্থাপত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হত ঢাকার রমনা কালীমন্দিরের মত। এই প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কথা উল্লেখ না করলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয়। ১৯৪৩ সালে বম্বেতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে পূর্ণচন্দ্র যোশীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ বিভাজন ও পাকিস্তানের দাবীর প্রতি সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে সকল ভারতবাসীর মনে রাখা উচিত যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কেবলমাত্র হিন্দু বাঙালীর পিতৃভূমি রক্ষা করেছিলেন তা নয়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কংগ্রেস দলের মধ্যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার্থে দ্বিমত তৈরিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য কৃপালনী, চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালচারি প্রমুখের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও এ. আই. সি. সি. ভারতবর্ষ বিভাজনের পক্ষে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাবটি ভোটের জন্য পেশ করতে বাধ্য হন। প্রস্তাবটির পক্ষে ২৯ জন এবং বিপক্ষে ১৫ জন ভোট দেন। মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টা, সমর্থন ও আবেদনের পরও এর চেয়ে বেশী সদস্যকে অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভাজনের পক্ষে রাজী করান যায় নি। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেয়ে কংগ্রেসের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা বা গদী দখল প্রাধান্য পেয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষের প্রথম সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা এবং সাংবিধানিক আইনসভায় যোগদান করেন হিন্দু মহাসভার সর্ব্বোচ্চ নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্পমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী হন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ। স্বাধীন ভারতবর্ষের শিল্পনীতি এবং শিক্ষানীতি রূপায়ণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতম উপাচার্য হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে তাঁর শিক্ষায় পঞ্চশীলের আহ্বান স্বাধীন ভারতবর্ষ তার শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করে। যে পাঁচটি অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্যের কথা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উল্লেখ করেছিলেন তা হল—

১) উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ করে যুব শ্রেণীর মধ্যে সুপ্ত গুণাবলীর উন্মেষ ঘটান।

২) কৃষ্টিমূলক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন।

৩) শিক্ষককুল যে শিক্ষাপ্রদান করবেন তা হবে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে।

৪) এক উদার ও মুক্ত পরিবেশে সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় শিক্ষার নিয়োজন।

৫) রাষ্ট্রের সাহায্যের হাতের সম্প্রসারণ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ লাভ করে ভারতবর্ষের প্রথম আই. আই. টি. (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি) মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে। ভারতবর্ষের প্রথম আই. আই. এম. (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) তৈরি হল কলকাতার পাশে জোকায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম শিল্প মন্ত্রীরূপে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের নবীনতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানচিত্রকে বদলে দেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কয়লা ও লৌহের অফুরন্ত ভান্ডার থাকা সত্ত্বেও ভারতে ছিল মাত্র তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। জামশেদপুরে টিস্‌কো, কুলটিতে ইস্‌কো এবং বেলুড়ে নিস্‌কো। স্বাধীনতার পরপরই শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর উদ্দ্যোগে স্থাপন করা হল রাষ্ট্র পরিচালিত লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, বোকারো এবং ভিলাইতে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝেছিলেন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সাবলম্বী না হলে ভারতবর্ষের উন্নয়ন অসম্ভব। স্বাধীনতার সময় অবধি ভারতবর্ষের রেল ইঞ্জিন আমদানি করা হত ইংল্যান্ড ও কানাডা থেকে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর উদ্দোগে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার এক বিস্তির্ণ রুক্ষ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হল এশিয়ার সর্ববৃহৎ রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। পুরো এলাকাটার নামকরণ করা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মরণে ''চিত্তরঞ্জন'' এবং কারখানাটির নামকরণ করা হল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দূরদর্শিতায় স্বাধীনতার পরপরই ভারতবর্ষ রেলইঞ্জিন নির্মাণে স্বনির্ভর হয় এমনকি রপ্তানিও শুরু করে। এছাড়া কৃষি বিপ্লবের স্বার্থে নির্মাণ করা হয় সিন্ধ্রিতে সরকারি সার কারখানা। একই সময়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর উদ্যোগ ও পরামর্শে উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মাঝে গড়ে ওঠে এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কারখানা ''হিন্দুস্থান মোটর''। এছাড়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী খুলে দিয়েছিলেন সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী হাজার হাজার বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের দরজা। আজ শিল্পক্ষেত্রে সারা ভারতব্যাপি যা উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় তার সকলেরই সূচনা প্রথম শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দূরদর্শিতায়।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ঘটে গেল আরো এক বিশেষ ঘটনা। বৃটিশ রাজশক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে সারে পাঁচশোর অধিক ছোট, বড় দেশীয় রাজ্যকেও স্বাধীনতা প্রদান করে। ভারত সরকারের প্রথম কাজ হয় এই সকল দেশীয় রাজ্য ও উপনিবেশগুলিকে ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত করার। সর্বপ্রথম ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত হয়। এরপর সারা ভারতবর্ষব্যাপী সকল দেশীয় রাজ্য সমূহ একে একে ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত হয়। বাকি থাকে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং পুর্টুগীজ শাসিত গোয়া-দমন-দিউ। কাশ্মীর রাজ হরি সিং ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকতে চান, সেই সুযোগে পাকিস্তান তার সোনাবাহিনীকে সাদা পোষাকে অস্ত্র সস্ত্র সমেত কাশ্মীরে ঢুকিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পাকিস্তান তাদের প্রথম গভর্নর জেনারেল নির্বাচিত করে মহম্মদ আলি জিন্নাকে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল রূপে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেই রেখে দেন। ভারতীয় সেনার সর্ব্বোচ্চ পদেও তখন বৃটিশ জেনারেল। ফলতঃ স্বাধীনতার পরও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই সুযোগে পাকিস্তান সেনা শ্রীনগরের দোরগোরায় পৌঁছে যায়। ভীত রাজা হরি সিং শ্রীনগর ত্যাগ করে জম্মু সরে যান এবং অন্যোপায় হয়ে কাশ্মীর ও জম্মুকে ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তকন ভারতীয় সেনা আকাশ পতে শ্রীনগর পৌঁছে পাকিস্তানি হানাদারদের তাড়া করতে শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পূর্ণ জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানি দখল মুক্ত করার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। এর ফলে কাশ্মীরের এক বিশাল অংশ পাকিস্তানের দখলে থেকে যায়। এই অংশটিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর বলা হয়।

অন্যান্য সকল দেশীয় রাজ্যের মত কাশ্মীরও বিনাশর্তে ভারতভুক্ত হলেও ডাঃ বি. আর আম্বেদকার ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের সংবিধানে বিশেষ ৩৭০ ধারা যুক্ত করেন। এছাড়া পরবর্তিকালে ৩৫এ নামক এক উপধারা যুক্ত করে কাশ্মীরের জন্য নিজস্ব আইন, টাকা, নিজস্ব নাগরিকত্ব, নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদির স্বীকার করে নেন। কাশ্মীর হয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেন এক আলাদা রাষ্ট্র।

মুসলমানদের দাবী মেনে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও একজন মুসলমানও ভারতবর্ষ ছেড়ে পাকিস্তানে যায় না। অপর দিকে স্বাধীনতার সাথে সাথেই পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে চলতে থাকে এক তরফা অমুসলমান যথা হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধদের ওপর অকথ্য নির্যাতন। লুঠ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নারী ধর্ষণ, নারী অপরহণ নিত্যদিন ঘটে চলে। পাকিস্তান সরকার সরাসরি এই হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের মদত দিয়ে চলে। প্রতিদিন কোটি কোটি সংখ্যালঘু নরনারী পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে থাকেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কোন প্রকার প্রতিবিধান অথবা পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টিতে বিরত থাকেন। উপরন্তু পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপনে ব্যস্ত থাকেন। এরূপ পরিস্থিতিতে জওহরলাল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরামর্শ ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

লিয়াকৎ আলির সাথে মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পাকিস্তানের সীমানায় তখন কোটি কোটি স্বজনহারা, সর্বস্বহারা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন শরণার্থী। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দুর্ভাগ্যবশত এই ১৯৫০ সালেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু হলে নেহরু মন্ত্রীসভায় ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ ও জাতীয়তাবাদি শক্তিকেন্দ্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং ভারতীয় হিন্দুদের সপক্ষে নেহরু মন্ত্রীসভায় আর কোন কণ্ঠস্বর থাকে না।

হিন্দু মহাসভার সর্ব্বোচ্চ নেতা হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এককভাবে সনাতন ভারতীয় আদর্শ ও জাতীয়াবাদি শক্তিকে একত্রিত ও শক্তিশালি করার লক্ষ্যে কাজ করে চললেন। এই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে সাক্ষাৎ হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সরসঙ্ঘের দ্বিতীয় সঙ্ঘচালক গুরুজী গোলওয়াকারের। গুরুজীর উৎসাহ ও পরামর্শ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে অনুপ্রাণিত করল একটা নতুন সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার। ২১ অক্টোবর ১৯৫১ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সূচনা করলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের পথ চলার। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও হন তিনি। সাথে একগুচ্ছ ভারতীয় আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ তরুণ যথা অটল বিহারী বাজপেয়ী, প্রেমনাথ ডোগরা, দেবপ্রসাদ ঘোষ, বলরাজ মাধোক, ও. রামারাও, বৎসরাজ ব্যাস, দীন দয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ। পশ্চিমবাংলার সংগঠন গড়ার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ডেকে পাঠালেন তার মন্ত্রশিষ্য, একান্ত অনুরাগী তরুণ অধ্যাপক হরিপদ ভারতীকে। পশ্চিম বাংলার ভারতীয় জনসঙ্ঘের মুখ হলেন তিনি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায়, কোনরূপ প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়াই ভারতীয় জনসংঙ্ঘ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হল ২৫ অক্টোবর ১৯৫১ সালে। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ প্রথম সাধারণ নির্বাচন পক্রিয়া সমাপ্ত হল। সদ্যজাত ভারতীয় জনসঙ্ঘ পেল ৩টি লোকসভা আসন, ২টা পশ্চিমবঙ্গে এবং ১টা রাজস্থানে। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচিত হলেন দুর্গাচরণ ব্যানার্জী। এছাড়া ভারতীয় জনসঙ্ঘের সহযোগী দল হিন্দু মহাসভা ৪টি ও রামরাজ্য পরিষদ পেল ৩টি আসন। প্রথম লোকসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সকল বিরোধী জাতীয়তাবাদি দলসমূহকে একত্রিত করে তৈরি করলেন ন্যাশানাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। লোকসভার বিরোধি নেতা হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রথম রাজ্য সমূহের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনসঙ্ঘ পশ্চিমবাংলা ও রাজস্থান থেকে ৮টি করে আসন লাভ করে।

এই সময় ঘটে আরো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মূলত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দাবী মেনে এবং চাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জমিদারি বিলোপ আইন পেশ করে। কিন্তু বিপদ আসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নিজের দলের মধ্য থেকেই। ভারতীয় জনসঙ্ঘের রাজস্থান বিধানসভায় নির্বাচিত ৮ জন সদস্য ছিলেন জমিদার। তারা তীব্রভাবে এই আইনের বিরোধিতা করে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। খবর পেয়ে জয়পুর ছুটে যান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সম্মেলন করে ঘোষণা করেন দলের সর্বভারতীয় নীতি। এই সম্মেলনে মোট ৮ জন বিধানসভা সদস্যর মধ্যে অনুপস্থিত থাকেন ৬ জন সদস্য। উপস্থিত ছিলেন ২ জন সদস্য ভৈরো সিং শেখাওয়াৎ এবং জগৎ সিং জালান। দলের সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তৎক্ষণাৎ অনুপস্থিত ৬ জন সদস্যকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে বহিস্কার করেন। উপস্থিত ভৈরো সিং শেখাওয়াৎ পরবর্তিকালে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এরূপ ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দৃঢ়চিত্ততা এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও সততা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং শেখ আবদুল্লার যোগসাজসে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারার সর্বাত্মক বিরোধি ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। মূলত তারই চাপে সংবিধানে ৩৭০ ধারায় লেখা হয় Temporary, Transitional and special Provision of Article 370। এই সাময়িক পরিবর্ত্তনমুখী ও বিশেষ কথাগুলির মধ্যে তাঁর দূরদৃষ্টি প্রতিভাত হয়। ভারতীয় সংবিধান বিশেষত দুর্গাদাস বসু কাশ্মীর প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন "The State of Jammu and Kashmir holds a peculiar position under the consitution"।

এবার শুরু হল ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধানের বিশেষ অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিটরাজ বাতিলের দাবিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর লাগাতার আন্দোলন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দাবী—

১) এক দেশ — সার্বভৌম এক এবং অভিন্ন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর সহ।

২) এক নিশান— স্বাধীন ভারতবর্ষের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকাকে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রয়োগ।

৩) এক আইন — জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতি ভারতবাসীর জন্য এক এবং অভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন।

৪) এক শ্লোগান — বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী কৃত ''বন্দে মাতরম'' (যে মন্ত্র ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন শয়ে শয়ে বাঙালী সহ ভারতবাসী) এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কৃত ''জয় হিন্দ'' (যে ধ্বনি আসমুদ্র হিমাচল সকল ভারতবাসীকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে)।

১৯৫৩ সালের ১১ মে পাঞ্জাবের উধমপুরে এক বিশাল

জনসভা করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সঙ্গে তরুণ অটল বিহারী বাজপেয়ী। সভা শেষে বাজপেয়ীজীকে ফিরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাব-কাশ্মীর সীমান্ত পেরিয়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। বিনা অনুমতিতে কাশ্মীর প্রবেশের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হল শেখ আবদুল্লার আদেশে। শুধু তাই নয় লোকসভার বিরোধী দলনেতা, ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি, শিক্ষাবিদ্ হিন্দু নেতাকে শেখ আবদুল্লা সাধারণ কয়েদির মত কারাগারে প্রেরণ করলেন। সারা ভারতবর্ষ প্রতিবাদে মুখর হলেও কংগেস দল এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিশ্চুপ। শ্বাসকষ্টজনিত অসুখে অসুস্থ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাশ্মীরের কারাগারে তীব্র ঠাণ্ডায় সঠিক চিকিৎসাও করা হল না। দেড় মাস পরে ২৩ জুন ১৯৫৩ প্রায় বিনা চিকিৎসায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হল ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শেষ নিঃশ্বাস এর সময় উপস্থিত এক নার্স যথার্থই বলেছিলেন "One Lion has been killed by Abdullah"। স্বাধীন ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, সর্বাঙ্গীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার্থে প্রথম বলিদান শহীদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রিয় শিষ্য ও সচিব অটল বিহারী বাজপেয়ী বিমানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মরদেহ নিয়ে কলকাতায় পৌঁছলে শোকস্তব্ধ মানুষের ঢল নামে। সারা ভারতবর্ষ নেহরু-আবদুল্লার চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ধিক্কারে ফেটে পড়ে আসমুদ্র হিমাচল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মাতৃদেবী, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জীর সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবী করেন। পশ্চিমবাংলার তৎকালীন চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও প্রথমে এই তদন্তের দাবী করলেও পরে চুপচাপ হয়ে যান। এক ব্যক্তির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার কারণে নীতিপরায়ণ, আদর্শবান, উচ্চ শিক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদের বিদায় ঘটল। এক দেশ, এক নিশান, এক আইন, এক শ্লোগানের প্রবক্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষায় নিজের জীবন বলি দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি জীবিত থাকলে ভারতবর্ষের রাজনীতি অন্য খাতে প্রবাহিত হত। দিল্লীতে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার স্থাপনের জন্য ১৯৭৭ সাল অবধি অপেক্ষা করতে হত না। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের জন্য ২০১৯ অবধি অপেক্ষা করতে হত না।

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ব্যারিষ্টার সোমনাথ চ্যাটার্জী লন্ডনে ব্যরিস্টারি পড়ার সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু সংবাদ পান। সোমনাথ চ্যাটার্জী লেখেন He was a Great Indian, Great Patriot, Great Educationist, Great Orator and a Great Human being."। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলন করেছিলেন তার আলোকবর্ত্তিকা আজও রাজনীতির জটিল আবর্ত্তে সমানভাবে দেদীপ্যমান। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের ঢক্কানিনাদের মাঝে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনাদর্শ রামধেনুর ন্যায় উদ্ভাসিত।

তিরোধানের পর দেখা যায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য হলেও বাজারে ব্যক্তিগত দেনার পরিমাণ কুড়ি হাজার টাকা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রাপ্ত একটা মাত্র জীবন বিমার কুড়ি হাজার টাকায় সেই দেনা মেটানো হয়। সব মিলিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল কেবলমাত্র কয়েকটি কলম ও পুস্তক।

পরিশিষ্ট

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যে ৩৭০ ধারা বিলোপ, এক দেশ, এক নিশান ও এক আইনের জন্য নিজ জীবন আহুতি দিলেন। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নিজ কাঁধে তুলে নিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের কাজ। পার্লামেন্টে আইন করে বিলুপ্ত করলেন অভিশপ্ত ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা। আজ জম্মু ও কাশ্মীর স্বাধীন ভারতবর্ষের সার্থক অঙ্গ রাজ্য। সারা ভারতবর্ষের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরেও আজ পত্ পত্ করে উড়ছে ভারতবর্ষের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। নাগরিকত্ব আইন সহ সারা ভারতবর্ষের সকল আইন আজ জম্মু ও কাশ্মীরেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এখন কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম ভারতবর্ষের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা সার্থকভাবে আসমুদ্র হিমাচল উড্ডীয়মান। জাতী-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর হাতেই জাতীয় পতাকা। সরকারি ও বিরোধি দলসমূহ সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিটিং-এ, মিছিল-এ, ধর্নায় আজ জাতীয় পতাকা। এমনকি যে বামপন্থীদের কাছে রক্ত পতাকা ব্যতীত সকল পতাকা ছিল অচ্ছুত আজ তাদের হাতেও জাতীয় পতাকা। বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ আজ আসমুদ্র হিমাচল ধ্বনিত। সারা ভারতবর্ষ আজ ঐক্যবদ্ধ।

অবশিষ্ট কাজ কেবলমাত্র এক আইন প্রবর্ত্তন। বিরোধিদের সমবেত বাধা সত্ত্বেও বর্বরোচিত তিন তালাক আজ বে-আইনি ঘোষিত। সকল ভারতীয় নারী একযোগে ফিরে পেয়েছে তাদের হত মর্যাদা। সকল ভারতবাসী আজ নিশ্চিত অদূর ভবিষ্যতে সারা ভারতবর্ষব্যাপি বিরাজ করবে সকল ভারতবাসির জন্য এক আইন, এক মর্যাদা, এক আশা, এক আকাঙ্খা, অখণ্ড সার্বভৌমত্ব।

এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে হবে: অমিত শাহ

ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের মাধ্যমে জন সংবাদ কর্মসূচির আয়োজন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সভাপতি জে. পি. নাড্ডার সুপরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি আগামীদিনে সারাভারতে সংগঠনগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। জন সংবাদ কর্মসূচি বাংলার সংগঠনের ক্ষত্রে মহিরুহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তাই কারণ যে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ভারতীয় জনতা পার্টির যে সঠিক নীতি সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়জিত তা সুনিশ্চিত হবে। বাংলার মানুষের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জনপ্রিয় শুধু নয়, বাংলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ও তৃণমূল স্তরের যে মানুষের জীবন যাত্রা যে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হতে পারে তার সুনিশ্চিত করা। বিজেপি নেতা মুকুল রায় নরেন্দ্র মোদির প্রথম ৫ বছরের শাসনকাল ও পরবর্তী ১ বছর অতিক্রান্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের সুশাসনের কথা বলতে গিয়ে তার সরকারের অধীনের যে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করে দ্বিতীয়বার জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছেন তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের সভাপতি দিলীপ ঘোষ রাজ্যের উন্নয়নের নামে মূখ্যমন্ত্রী সরকার ও দলের

মিশ্রণ ঘটিয়ে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম করে বাংলাকে ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে রাজ্যে কাজ করতে অনবরত বাধা দিচ্ছে। বিরোধী জন প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়া সত্বেও করোনা ও আমফানের মতো ঝড়ের কবলে বিধ্বস্ত গ্রামের গরিব ও দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারছেন না। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী নির্বাচিত সংসদদের ভুয়ো অজুহাত দেখিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখতে বা তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধা দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন না তৃণমূলের দুর্নীতি আমরা জানো জানতে না পারি।

করোনা ও আমফমের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়েও যে অর্থ গরিবদের পরিবারে হাতে বা ব্যাংকে যাওয়ার কথা তা তাদের কাছে না গিয়ে তৃণমূল নেতাদের ব্যাংক একাউন্টে জমা পড়েছে। কি সাংঘাতিক দুর্নীতিতে পরিপূর্ন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। এদের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদেরও বারবার পথে নামতে হবে। আগামী একুশের শপথ

নতুন বাংলা গড়ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী বলেন, বাংলার মানুষের প্রতিবাদকে হিংসা মনে করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই, রুখে দাঁড়ালে মাওবাদী। শিশুদের ও মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাজ্যের কোনো দায় নেই। বেকার যুবক ও যুবতীদের এই রাজ্যে কোনো দিশা নেই। যার ফলে শিক্ষিত ছেলে ও মেয়েরা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। শ্রমিকদের কোন কাজ নেই, তারা পরিয়ায়ী হতে বাধ্য হচ্ছেন। এই বাংলার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই বাংলার স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজন। করোনার মতো তৃণমূল বিজানুমুক্ত সরকার গঠন করতে হবে। জন সংবাদ কর্মসূচি কে সুদূর প্রসারী করে সারা ভারতে তার সুফল পৌঁছে দিতে সর্বভারতীয় সভাপতির এই তথ্যপ্রযুক্তি ভাবনা সাংগঠনিকভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাই বাংলার মানুষের কাছে জন সংবাদ কর্মসূচি এক অভিনব সংযোগ অভিযান বলে মনে করে সভায় উপস্থিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সংগঠনের কর্মীদের অভিনন্দন সহ বাংলার প্রতিটি ঘরের মা, বোন ও ভাইদের এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে এই কর্মসূচির প্রয়োজন রয়েছে। বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলার মনিষীদের স্মরণ করলেন এবং জানালেন এই বাংলার অতীতের ইতিহাস, সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন। যে বাংলা একসময় সারা ভারতের দিশারী ছিল, সেই বাংলার বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা পিছিয়ে।

এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের এই জন সংবাদ কর্মসূচী বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে এক আধুনিক আত্মিক যোগাযোগ। যা আগামী একুশের গণআন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। বাংলার রাজনৈতিক ছবি বদলাতে শুরু করেছে। তাতে ক্ষিপ্ত বর্তমান সরকার হিংসার মাধ্যমে বিভক্ত করতে চাইছেন।

রাজনৈতিক ভাবে দৈন্যতা দেখা দেওয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে , মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। করোনা মহামারী তে যারা পরিবারের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন, আমফমের ঝড়ে অসহায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাছাড়া রাজ্যে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পেতে বিজেপি কর্মীদের খুন করা হয়েছে, মা ও বোনেদের ইজ্জতলুট হয়েছে, সেইসব পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি জি, প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রাহন করে যে যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন, তার প্রতিফলন ঘটছে ধীরে ধীরে। ৭০ বছরের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, বিগত কেন্দ্রীয় সরকার দেশ কে কিভাবে ন্ট্রিত করেছে। শপথ নিয়েই যে কাশ্মীরে ভারত মাতার সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে রুদ্ধ কারাগারে আটক রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে তিনি কি করতে পারেন। তিন তালাক, মুসলিম মা ও বোনেদের সুরক্ষায় যা বিরল সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস সাহস দেখতে পারেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি তা করে দেখিয়েছে। এর নাম শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে, দেশের পিছিয়ে পরা মানুষের কল্যাণে আরও বেশি করে মাননিবেশ করেছেন। বিনামূল্যে উজলা গ্যাসের ব্যাবহার, আবাস যোজনায় প্রতিটি গরিব মানুষের মাথায় ছাদ, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ বিশেষকরে মহিলাদের এক নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হতো। স্বাধীনতার ৬৭ বছর ধরে কংগ্রেস শুধু দেখেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি সারা ভারতের গরিব মানুষের পাশে থেকে স্বচ্ছ ভারত গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে শৌচালযের ব্যবস্থা

হয়েছে। প্রতিটি কৃষক সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন। পিছিয়ে পরা গরীব মানুষের সঙ্গে ব্যাংকের সরাসরি যোগ স্থাপন হয়েছে। সৌভাগ্য যোজনায় ২.৫ কোটি মানুষের ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। সড়ক যোজনায় সারা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা সারা দেশে চালু হয়েছে, কিন্তু বাংলার মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা নিয়ে সংশয়ে আছেন। যদি বাংলার মানুষ বিজেপি কে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, কেন্দ্রীয় অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই বাংলার কালো দিন থেকে মুক্তির পথ আগামী ২১ শের শপথ। দিকে দিকে কর্মীদের কাজ করতে হবে। শরণার্থী নিয়ে বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী। দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষ আজ আর তৃণমূলের পক্ষে নেই, মমতা দিদি, টের পাচ্ছেন। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের হেনস্থা করে পুলিশের আইন দিয়ে দাবিয়ে রাখো। রাজ্যের সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে

রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করো। এই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরাতে মমতা দিদি কিছুতেই রাজী নন।

কারণ তিনি জানেন এই করোনা পরিস্থিতিতে তার রাজ্যের অবস্থা বেহাল, আর্থিক দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ দল ও সরকারের কাছে পরিযায়ী শ্রমিক গলার কাঁটা। তাই এদের রাজ্যে ফেরাতে অনীহা। কেন্দ্রীয় দরকার ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা করে পরিসংখ্যান পাঠাতে বললেও মমতা দিদির সরকার তা পাঠাতে চান নি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক অনুদানের আবেদন করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষের স্বার্থে পরিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পে বরাদ্দ থাকা সত্তেও রাজ্য তা নিতে চাইছে না। যেখানে আর্সেনিক যুক্ত পানিয় জল রয়েছে সেইসব এলাকায় জলশক্তি মন্ত্রণালয় মাধ্যমে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। তা থেকেও বঞ্চিত গরীব মানুষের পরিবার। বাংলার মেট্রো সিটির পরিধি বাড়ানো, নিউটাউন অঞ্চলে সোলার সিটি, সহ আরো প্রকল্প আছে। ভারতের সীমা সুরক্ষায় চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের একলাব্য প্রকল্পে আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজে এই রাজ্য সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই সদিচ্ছাও নেই। শুধু বিরোধিতা।

সাম্প্রতিক করোনা ও আমফমের জন্য অর্থ পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকেই এসেছেন, আর্থিক অনুদানের জন্য ধন্যবাদ টুকুও জানায়নি মুখ্যমন্ত্রী, অথচ পাশের রাজ্য উড়িষ্যা ৫০০ কোটি অনুদানের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এটা হচ্ছে সৌজন্য তা। প্রধানমন্ত্রী দলিত ও পিছিয়ে পরা গরিব মানুষের জন্য ১৭০০০০ কোটি টাকা ধার্য্য করেছেন।

করোনার জন্য স্বাস্থ্যবিধি ও দুরাত্মবিধি যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, সারা বিশ্বে জনপ্রিয় লাভ করেছে। পররাষ্ট্র নীতির সঠিক প্রয়োগে আজ আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সহায়তা প্রদান করবে।

তিনি বিশ্বাস করেন 'এক রাষ্ট্র, এক মন ও এক জন'।

তাই সারা ভারতের অখন্ডতা রুখতে ভারতের সকল মানুষের যোগদানের প্রয়োজন। তাই করোনা মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জন সংবাদ কর্মসূচির অভিনব কৌশল বিজেপির সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ ও সরাসরি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বার্তা পৌঁছানোর প্রয়োজন। এই বাংলার মান বজায় রাখতে ১৫ বছর ধরে বোমাবাজি, ধর্ষণ, খুন ও গরিব মানুষের খাদ্যের যোগান নিয়ে তোলাবাজি, রেশন দুর্নীতি, বেআইনি জমি দখল, ও সিন্ডিকেট ছুঁড়ে ফেলতে লোকতান্ত্র কায়েম করতে হবে। কংগ্রেস আমলে এই রাজ্য ২.৫ লক্ষ কোটি পেয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ৫ বছরে ৪.৫ লক্ষ কোটি দিয়েছে। এত টাকা কোথায় খরচ হলো। সিন্ডিকেট গড়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র রাজনীতি করে চলেছেন মমতা দিদি।

তাই বাংলার মানুষের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আগামী ২০২১ শের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে মতদান করবে এই আশা রাখি।

একটি টুইট, একটি রাজনৈতিক দল এবং কিছু বিতর্ক

বিমল শংকর নন্দ

গত ১২-ই মে একটি টুইট দেখে অনেকেই চমৎকৃত হন, বহু মানুষ খুবই আনন্দিত হন, এমন কি এখনকার নিদারুণ অবস্থার মধ্যেও। টুইটটা ছিল—Be careful China, Indian forces know how to defang the venomous snakes like you, entire world is watching the sinister design of yellow expansionist. I would suggest the Government to accord diplomatic recognition to Taiwan without much delay. (ওহে চীন খুব হুঁশিয়ার, ভারতের সৈনিকরা জানে তোমার মতো বিষধর সাপের বিষদাঁত কিভাবে ভেঙে দিতে হয়। গোটা বিশ্ব দেখছে পীত সম্প্রসারণবাদীদের অশুভ উদ্দেশ্য। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবো আর দেরী না করে তাইওয়ানকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে)। লেখাটা পড়ে ভালো লাগবে বহু মানুষেরই। কিন্তু চমকে যেতে হয় টুইটটির লেখকের নাম দেখে। লেখক আর কেউ নন, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ২০১৪ এবং ২০১৯ - পরপর দুবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৩ - এর এক দশমাংশ অর্থাৎ ৫৫ টি আসন পেতে ব্যর্থ হয়। ফলে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি এই দলের জোটে নি। বিরোধী দলের নেতা হলে অধীর চৌধুরী হতেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন। তবু ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নিম্নকক্ষ লোকসভার সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের নেতা হওয়াও যথেষ্ট সম্মানের। আর একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে অধীর চৌধুরীর ক্ষমতা এবং প্রভাবকে কেউই অস্বীকার করেন না। বাংলার যে কজন রাজনৈতিক নেতা রাজনীতির মাটি বেশ ভালো চেনেন অধীর চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। বাম আমলে সি পি এম -এর সাথে লড়ে আর তৃণমূলের আমলে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে লড়াই করে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব টিকিয়ে রাখা কম কথা নয়।

কিন্তু একজন সফল ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হওয়া আর রাষ্ট্রনীতির সমস্ত দিকগুলিকে আত্মস্থ করা এক নয়। এতদিন লোকসভার সদস্য থাকা স্বত্ত্বেও রাষ্ট্রনীতির আত্মস্থকরণের কাজটা অধীরবাবুর যে একেবারেই হয় নি তা কিন্তু বারবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেতা তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ""বিখ্যাত""। গতবছর কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে লোকসভায় যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন অধীর চৌধুরীর একটি মন্তব্য ব্যাপক বিতর্ক তৈরী করেছিল। লোকসভায় বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে তিনি বলে বসেছিলেন - "কি করে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে যখন ১৯৪৮ সাল থেকে এই অঞ্চল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষণে আছে?" লোকসভায় শাসক বিজেপির সদস্যরা কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার এই সুবর্ণ সুযোগ একেবারেই ছাড়েন নি। বিশেষত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অমিত শাহ -এর পালটা আক্রমণে কংগ্রেস দৃশ্যতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তবে পাকিস্তানের কানে এই বক্তব্য হয়তো খুবই মধুর বাণী বর্ষণ করেছিল। সেখানকার সংবাদমাধ্যমে খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল এই বক্তব্য।

আগেই বলেছি, চীনকে নিয়ে অধীর চৌধুরীর টুইট লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মনের কথা। ২০২০ সালের শুরু থেকেই গোটা পৃথিবী করোনা ভাইরাস কোভিড - ১৯ দ্বারা সৃষ্ট অতিমারীতে বিপর্যস্ত। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ আক্রান্ত। বিশ্ব অর্থনীতিও ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে। আর এই বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের জন্য যে দেশটির দিকে প্রায় সকলেই আঙুল তুলছে সেই দেশটি হল চীন। গত ১৮-ই মে জেনিভায় ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লি (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন -এর এগজিকিউটিভ বডি) - এর সভায় ভারতসহ ১২০ টি দেশ চীনের উপর প্রবল চাপ তৈরী করে করোনার উদ্ভব নিয়ে প্রকৃত তদন্ত করতে। সকলেই চাইছে চীন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিক। উহান করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কবে বোঝা গেল? এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কি ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে রাখা হয়েছিল? কেন বারবার চীনের উহান থেকেই একের পর এক প্রাণঘাতী ভাইরাস ছড়াচ্ছে? এতোদিন গোটা বিশ্বের দাবী ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিলেও বিশ্ব জনমতের চাপে চীন শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে দিতে নিমরাজি হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত ২০২০-এর ২২- শে মে থেকে ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লি-এর চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত হতে চলেছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লিতে তাইওয়ানকে অবজারভার হিসাবে গ্রহন করা হবে কিনা সে নিয়ে এখন তীব্র টানাপোড়ন চলছে চীন এবং তার গুটিকয় সমর্থক দেশের সাথে

বিশ্বের বাকী দেশগুলোর। চীন মনে করে তাইওয়ান হল তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তাকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অঙ্গীভূত করা তার পবিত্র কর্তব্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে ""এক চীন"" নীতি মেনে চললেও চীনের বিরুদ্ধে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা তাইওয়ানকে ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লিতে অবজারভারের মর্যাদা দিতে মরীয়া। এক্ষেত্রে এই এসেমব্লি-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা মোকাবিলায় তাইওয়ান কেবল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাই পালন করে নি, ভারতের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাইওয়ান ভারতকে দশলক্ষ ফেস মাস্ক পাঠিয়েছে এদেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য। ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেমব্লি- এর চেয়ারম্যান হিসেবে এবার ভারতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে তাইওয়ানকে অবজারভার -এর মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকার উদোগকে সমর্থন করবে নাকি চীনের বিরোধীতাকেই সমর্থন করবে। ভারতের বর্তমান বিদেশ নীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এটা বোঝা কঠিন নয় যে চীনকে চাপে রাখতে তাইওয়ানকে অবজারভারের মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগকে সমর্থন করার সম্ভাবনাই বেশী। চীনও এটা ভালোই বোঝে। তাই মে মাসের শুরু থেকেই চীন ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি শুরু করেছে। প্রথমে উত্তর সিকিমে ভারত - চীন সীমান্তের কাছে চীনের সেনাবাহিনী People's Liberation Army বা PLA - এর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর লাদাখ অঞ্চলে ভারত - চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চীনা হেলিকপটারের আনাগোনা আটকাতে ভারতকে ফাইটার জেট পাঠাতে হয়।

উত্তেজনার এই আবহে অধীর চৌধুরী তাঁর টুইট করেছিলেন গত ১২ই মে। কিন্তু মনে রাখতে হবে অধীর চৌধুরী যে দলের নেতা সেই কংগ্রেস দলটিই চীনের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে সবচেয়ে বেশী অস্বস্তির মুখোমুখি হয়। ১৯৬২ সালের অক্টোবর - নভেম্বরের চীন ভারত যুদ্ধে ভারত শুধু শোচনীয় ভাবে হেরে যায় নি, ভারতের ৩৭৫৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীন দখল করে নেয়। আর ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ১৯৬৩ সালে এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে জোর করে দখল করা কাশ্মীরের একটি অংশ (প্রায় ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা) চীনকে দান করে দেয়, যার ভেতর দিয়েই চীন বানিয়েছে বিতর্কিত কারাকোরাম হাইওয়ে। চীনের প্রতি নেহেরুর প্রেম ছিল গভীর। প্রত্যুত্তরে পেয়েছিলেন ১৯৬২-এর যুদ্ধ। স্বাধীনতার পর নিজেকে বিশ্বনেতা, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে মশগুল নেহেরু ভুলেই গিয়েছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হয় সবার আগে। চীনের কাছে প্রায় সুইজারল্যান্ড -এর সমান জায়গা খুইয়ে সমালোচনার মুখে নেহেরুর অদ্ভুত উক্তি ছিল আকসাই চীনে একটা ঘাসও জন্মায় না। কিন্তু যারা প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে সামান্য চর্চাও করে তারা জানে আকসাই চীনের দখল চীনকে সামরিক - কৌশলগত ক্ষেত্রে কতখানি এগিয়ে দিয়েছে। চীনের ব্যাপারে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের অদ্ভুত মনোভাব এবং কাজকর্ম এখনো চলছে। গত ২০১৭ সালে কংগ্রেসের তৎকালীন সহ সভাপতি রাহুল গান্ধী ভারতে চীনের রাষ্ট্রদূত লুও ঝাও হুই -এর সাথে এক রহস্যজনক গোপন বৈঠক করেন। রহস্যজনক কারণ কংগ্রেস প্রথমে এই বৈঠকের কথা বেমালুম অস্বীকার করেছিল। এ বিষয়ে মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরকে ফেক নিউজ বলে উল্লেখ করা হয়। পরে সরকারি ভাবে চীনের দূতাবাসের তরফে রাহুল গান্ধীর সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের কথা স্বীকার করা হয়। অস্বস্তিতে পড়ে কংগ্রেসও এই বৈঠকের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাহুল গান্ধী চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করতেই পারেন। এতে আইনগত কোন বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ প্রথা অনুযায়ী এই ধরণের সাক্ষাতকারের কথা সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস এই ধরনের বৈঠকের কথা অস্বীকার করাতেই রহস্য দানা বাঁধে। আর এই বৈঠক হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ডোকালাম অঞ্চলে ভারত চীনের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এক চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে। আর কংগ্রেস ডোকালাম ইস্যুতে মোদি সরকারকে প্রতিদিন সমালোচনায় বিদ্ধ করছিল। আবার ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ২০১৮সালে রাহুল গান্ধী তাঁর কৈলাস - মানসসরোবর যাত্রাকালে চীনের দুজন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আইনগতভাবে এতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ভারত সরকার বা ভারতের মানুষকে অনেকদিন এই সাক্ষাতের কথা জানানো হয় নি। পরে রাহুল নিজেই একবার এই সাক্ষাতের কথা বলে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে জাতীয় পর্যায়ের নেতারা অন্য দেশের দূত বা সরকারি পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করলে তা দেশের সরকার এবং সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দেন যাতে কোন সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী না হয়। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতার এই আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া সত্যিই কঠিন।

সুতরাং চীন কংগ্রেসের কাছে বরাবরই এক অস্বস্তির জায়গা। অধীর চৌধুরীর টুইট কংগ্রেসের সেই অস্বস্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে কংগ্রেসকেও ড্যামেজ - কন্টোলে নামতে হয়। কংগ্রেস দ্রুত অধীর চৌধুরীর বক্তব্যের থেকে দলকে দূরে রাখতে উদ্যোগী হয়। দলের রাজ্যসভার সদস্য আনন্দ শর্মা বলে দেন অধীর চৌধুরীর বক্তব্য একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। এর সাথে দলের কোন সম্পর্ক নেই। শর্মা আরো বলেন কংগ্রেস বরাবরই ভারত-চীনের কৌশলগত সমঝোতাকে গুরুত্ব দেয়। এরপর অধীর চৌধুরীও তাঁর টুইটটি মুছে ফেলেন।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গোটা বিশ্বের মতো ভারতও ব্যতিব্যস্ত। সাধারণ মানুষও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে রাজনীতির বিষয়ে ততটা চিন্তা করতে চাইছে না। কিন্তু করোনা পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে চীনকে নিয়ে ঝড় বইবেই। ভারতকেও চীন সম্পর্কে স্পষ্ট নীতি ঠিক করতে হবে। ভারতের চীন নীতি নিয়ে যখন বিতর্ক -বিশ্লেষণ চলবে তখন কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। তাতে কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি

শ্রীচরনেষু মাননীয়া,

আশাকরি আপনার শরীর, স্বাস্থ্য এবং মস্তিষ্ক সব সুস্থই আছে। চাপ তো আর কম যায় না। সবদিক সামলে সুস্থ থাকাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ২০১১ সালে আপনার আগমন পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনেই আশা এবং নতুন স্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন আপনি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবেন। উন্নতির এক নতুন জোয়ার আনবেন। আমি কিন্তু শুরু থেকেই সন্দিহান ছিলাম। শিল্পোন্নয়নের (নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, টাটার কারখানা) মৃতদেহের উপরে পা রেখে যে সিংহাসনে আরোহন করল, অনৈতিকতার মধ্যে দিয়েই যার পথ চলা শুরু, তার কাছে কোনোকালেই আমার তেমন কোন আশা ছিল না।

তবে একটা কথা আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল। যে পরিমাণ জনসমর্থন বা ম্যান্ডেট আপনার কাছে ছিল, তা এই রাজ্যের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় ঘটনার জন্য যথেষ্ট। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, ভোটারদের মন ভোলানোর জন্য হাওয়াই মিঠাই না বিলিয়ে সংস্কারের কিছু তেতো পথ্য আপনি ইচ্ছে করলেই প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু আপনি তো আপনি। একমেবাদ্বিতীয়ম। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে থানায় ঢুকে সমাজবিরোধী ছাড়ানো দিয়ে আপনার যে ইনিংস শুরু হলো তা যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

একটি শাসন ব্যবস্থায় বা একটি সরকারের সবাই ভালো থাকবে বা সব ভালো কাজ হবে, এটা আশা না করাই ভালো। কিন্তু যে সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী থেকে সাধারণ কর্মী, যারা কিনা একেকজন অন্যায় ও দুর্নীতির বড় বড় ডিলারশিপ নিয়ে বসে আছেন, তাদের নিয়ে কি আশা করব বলুন তো? শুরুর দিকে অনেকে বলত চেলা চামুন্ডা গুলো টাকা মারলেও, উনি সৎ। আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। আমি শুরু থেকেই বুঝেছিলাম সমস্ত অন্যায় এবং দুর্নীতির জননী আপনি। স্বয়ং আপনি। ওই চেয়ারে বসে অন্যায়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস করা বা প্রশ্রয় দেওয়া মানে, 'রাজা যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ'। সুজেট, দময়ন্তী.. এদের কথা মনে পড়ে? এরপর যা পারফরমেনস শুরু হল— প্রতিদিন নতুন নতুন রেকর্ড। সেই তালিকা তৈরি করতে গেলে কয়েক খণ্ড কথাঞ্জলি হয়ে যাবে। টেট কেলেঙ্কারি, ফুড অফিসার নিয়োগ কেলেঙ্কারি, ডব্লিউবিসিএস অফিসার নিয়োগ কেলেঙ্কারি, গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি নিয়োগ কেলেঙ্কারি, আপার প্রাইমারি কেলেঙ্কারি, রেশন দুর্নীতি, কলেজের ছাত্র ভর্তির দুর্নীতি, কাটমানি—কোনটা বাদ রেখেছেন বলুন তো? আপনার প্রথম ভোট জেতা সারদার টাকায়। খেটে খাওয়া মানুষগুলোর টাকা যখন জলের মতন ভেসে গেল তখন আপনি কি নিদান দিলেন? 'বেশি করে সিগারেট খান, ওই টাকায় ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে'। সুদীপ্ত সেনকে চুষে চুষে চোষা আম বানিয়ে তদন্ত শুরু হল সব ধামাচাপা দেবার জন্য। কী অবলীলায়, কী অসামান্য দক্ষতায় রাজীবকে দিয়ে সব প্রমাণ মুছে ফেললেন। এই সবের কারিগর আপনি ছাড়া আর কে, বলুন তো? তাই 'দিদি ভালো, বাকিরা খারাপ'—এটা শুনলে আমার হাসি পায়। গত কয়েক বছরে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, স্বজনপোষণ, মুসলিম তোষণের যে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছেন, তা বাংলাকে সত্যি এগিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষ বা বিরোধী দল এটা ভেবে কিংকর্তববিমুর যে কোনটা কে ইসু করবে বা কোনটার সমালোচনা করবে। আগেরটা থেকে পরের কুকীর্তি, ধারে ও ভারে এত বড় যে বুঝতেই পারে না কোনটা ছেড়ে কোনটা নিয়ে কথা বলবে।এদিক দিয়ে সত্যি আপনি বিরোধীদলকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন।

যখন বুঝলেন নৌকাতে অনেক ফুটো হয়ে গেছে, অনেক জল ঢুকেছে, এবার ডোবার উপক্রম, তখন পিকে কে ডাকলেন জল ছাকতে। সেও কি আর কম বাটপার! কয়েকশো কোটি টাকা ঝেঁপে নতুন নতুন স্টান্ট এর ব্যবস্থা করল—'দিদি কে বল', 'বাংলার গর্ব...'। এর শেষতম সংযোজন আমফানের টাকা মারা নেতা তথা দুর্নীতির বোয়াল মাছ দের শোকজ করা। যে দলের নেতাকর্মীরা বিগত বছরে গুলিতে এটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে যে পার্টি করে টাকা মারা আমার জন্মগত অধিকার, গত ৯ বছরের যাদের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ না, বটগাছ হয়েছে, তাদের করা হচ্ছে শোকজ!!! যাদের করা হচ্ছে তারা তো এটা ভেবে হেসে কুটোপাটি যে, যে শোকজ করছে সে তো আরো বড় চোর। এই ভাবেই বেকার সমস্যা সমাধানে পার্টি অসামান্য সফলতা পেয়েছে।

আপনাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই—ওসব গুলে খেয়ে ফেলেছেন। প্রতিদিন পেপার, টিভিতে যা বের হচ্ছে, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। কত মায়ের লজ্জা নিবারণের কাপড়, কত শিশুর মুখের গ্রাস, কত পরিবারের মাথার ছাদ আপনারা খেয়ে

ফেলেছেন তার হিসেব কি কেউ রেখেছে? কোনটা বাদ রেখেছেন, বলুনতো? শিক্ষা,স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি—সব, সব ধ্বংস হয়ে গেছে এই ১০ বছরে। পশ্চিমবঙ্গ কুড়ি বছর পিছিয়ে গেছে। মানুষ টের পাবে। যতদিন যাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে কি নিদারুন ও ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। এমফিল, পিএইচডি করে ১০০ দিনের কাজ করার সময় আসছে।

মাননীয়া, মুশকিলটা কোথায় জানেন? এই কয়েকটা বছরে শুধু যে দুর্নীতি, অন্যায়, কাটমানি, বেকারত্ব বেড়েছে, তা কিন্তু নয়। ক্ষতিটা হয়েছে অনেক গভীরে। একটা অনৈতিক শাসনব্যবস্থা যে সমাজ এবং সমাজের মানুষের নৈতিকতা কে কতটা দূষিত এবং কলুষিত করতে পারে তা আপনারা করে দেখিয়েছেন। যে মূল্যবোধের অবক্ষয় বাংলা সমাজে দেখা যাচ্ছে, তাতে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। যে খুনোখুনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি আপনারা তৈরি করেছেন তা ভূ-ভারতে দেখা যায় না। নালার পুতিগন্ধময় রাজনৈতিক পরিবেশে কোন শিক্ষিত ভদ্র মানুষ আর পদার্পণ করতে চান না। অনেকে ভাবে একুশে বদল হলে সব ঠিক হবে। ঘোড়ার ডিম। আপনারা তাহলে এখনো বুঝতেই পারেননি খতটা কতটা গভীর। চিন্তাটা কোথায় জানেন মাননীয়া? একুশে হয়তো আপনি, আপনার ভাইপো পাততাড়ি গুটিয়ে বিদায় নেবেন। কিন্তু রাজ্যটার কি হবে বলুন তো? আমফানের থেকেও বড় ঝড় আপনাদের ১০ বছরের শাসন। আমফানের থেকেও অনেক বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে দিয়ে গেল রাজ্যটার।

ইতি,

সুমন কর্মকার

মমতাময়ীর পুলিশ

দীপ্তাশ্য যশ

আমাদের রাজ্যে এখন পুলিশ বলতে আপনার চোখে কোন ছবিটি ভাসে বলুন তো? একজন কড়া আইন রক্ষক? না কি টেবিলের তলায় ঢুকে ফাইল দিয়ে মাথা বাঁচাতে চাওয়া এক অসহায় সরকারী কর্মচারী?

আমাদের রাজ্যে এখন পুলিশের এটাই ছবি। গার্ডেনরিচে কলেজের ভোটের সময় দুষ্কৃতিদের গুলিতে পুলিশের অসহায় মৃত্যু। বীরভূমে দুষ্কৃতিদের বোমাবাজির মধ্যে পরে পুলিশের মৃত্যু। এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যে পুলিশের অবস্থা। যারা আইনের রক্ষক, আমাদের রক্ষাকর্তা তারা নিজেরাই অসহায়। কারন মমতা ব্যানার্জীর নীতি তার সরকারের আমলে পুলিশ গুলি চালাবে না।

আমরা দেখেছে কালিয়াচকে জেহাদী জনতা থানা পুড়িয়ে দিয়েছে, ধূলাগড়ে তান্ডব চলেছে, বসিরহাটে হিন্দুদের উপরে চরম আক্রমণ নেমে এসেছে। একই ঘটনা ঘটেছে ক্যানিং, মুর্শিদাবাদ সর্বত্র। এমনকি এবারেও আমরা দেখলাম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতার নামে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে মুর্শিদাবাদ সর্বত্র একই দৃশ্য। জেহাদী দুষ্কৃতিরা তান্ডব করছে আর পুলিশ নীরব দর্শক। এমনকি সেই তান্ডবের জেরে রেল পরিষেবা সম্পূর্ন বিপর্যস্ত হয়ে পরলেও, রেলের কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও পুলিশ নীরব দর্শক। সাকরাইল, সাতরাগাছি, মালদহের ভালুকা সর্বত্র একইদৃশ্য। জেহাদীরা তান্ডব চালাচ্ছে, জনগনের সম্পত্তি নষ্ট করছে কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শক। কারন সরকারের নির্দেশ হচ্ছে কোনভাবেই পুলিশের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্য করে গুলি তো চালানোই যাবেনা। কিন্তু এই নির্দেশ কি সবক্ষেত্রের জন্য? নাকি কিছু বিশেষ ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য? কিছু ঘটনার দিকে তাকালে মনে হয় এই নিষ্ক্রিয়তার নির্দেশ কিছু বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইসলামপুরের ঘটনা তো আমাদের সবারই মনে আছে। ইসলামপুরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল বাংলা এবং ভূগোল শিক্ষকের। কিন্তু তার বদলে সেখানে নিয়োগ করা হয় উর্দু শিক্ষক। যদিও স্কুলের উর্দু পড়ুয়া একজন মাত্র। সেই নিয়ে আন্দোলন শুরু হলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে গুলি চালায়। মারা যায় রাজেশ ও তাপস নামে স্কুলের দুই ছাত্র।

২০১২ সালের ১৪ই নভেম্বর নদীয়ার নদীয়ার হাউলিয়া গ্রামে পুলিশের গুলিতে মারা যান অশোক সেন। অপরাধ — তিনি ও তার গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কারন তাদের বহুবছর ধরে চলা পুজো পুলিশ বন্ধ করে দিতে চাইছিল। সেই অবরোধ হটাতে গেলে পুলিশ ও জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলিতেই মারা যান অশোক সেন।

আরও একটি ঘটনা হাওড়া জেলার তেহট্টের। সেখানকার স্কুলে জেহাদীদের দাবী মতো সরকার সরস্বতী পুজো বন্ধ করতে চাইলে স্কুলের ছেলে মেয়েরা ন্যাশানাল হাইওয়ে অবরোধ করে। সেই অবরোধ হঠানোর জন্য পুলিশ লাঠি চালায়। লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটে ১২ বছর বয়সী একটি মেয়ের।

আরও একটি ঘটনা ভাটপাড়ার এবছর জুন মাসে। এখানে একটি রাজনৈতিক মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় পুলিশ। মৃত্যু হয় ধরমবীর সাউ নামের এক হকারের।

আরও একটি ঘটনা হোল দার্জিলিং-এর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। মারা যান বিমল শশাঙ্কের, সুনীলরাই এবং মহেশ গুরুং।

দেখা যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জীর আমলেও পুলিশ সক্রিয়তা দেখায়। কিন্তু সেই সক্রিয়তা জেহাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দেখা যায়না। তখন পুলিশ নীরব দর্শক। পুলিশের যাবতীয় সক্রিয়তা শুধুমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তাই কালিয়াচক হোক বা বসিরহাট, ধূলাগড় হোক কিংবা ক্যানিং, জেহাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে। এলাকার হিন্দুরা ঘর ছাড়া হয়। নষ্ট হয় কয়েক কোটি টাকার সরকারী সম্পত্তি। গার্ডেনরিচ বা মেটিয়াবুরুজে আক্রমনে নিহত হন পুলিশকর্মী। কিন্তু পুলিশ নিশ্চুপ। কারন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মতে এগুলি সব ছোট ছোট ঘটনা। তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশি এই নিষ্ক্রিয়তার নীতি অবশ্য দেখা যায় না। সেখানে পুলিশ ছাত্রদের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালাতেও দ্বিধা বোধ করে না। প্রশ্ন ওঠে কেন এই বিভাজন? কেন এই বিদ্বেষ শুধুমাত্র এক শ্রেনীর প্রতি?

এর উত্তর হোল একটাই। ভোট ব্যাঙ্ক। যে মমতা ব্যানার্জী সংসদে ২০০৫ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বলতে না পেরে স্পিকারের মুখে কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আজ তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছেন। সংবিধান অবমাননা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করছেন না। কারন সেদিন যে অনুপ্রবেশকারীরা তার বিরুদ্ধে ছিল আজ তারাই তার ভোটব্যাঙ্ক। সেই সাথে আছে তার দলের প্রতি জেহাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির সমর্থন। সেই কারনে জেহাদী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে তিনি নিশ্চুপ। তার মতে সেগুলি ছোট ছোট ঘটনা। কারন তারা তার ভোটব্যাঙ্ক। সেই ভোটব্যাঙ্ককে খুশী করতেই নদীয়া থেকে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর তার পুলিশ হিন্দুদের উপরে গুলি চালাতেও দ্বিধাবোধ করে না। কারন তিনি মনে করেন এই হিন্দুরা তার ভোটব্যাঙ্ক নয়। তাই এদের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা তার নেই।

মানুষ সবই দেখছে, সবই বুঝছে। তারা বুঝতে পারছে তাদের এক জোট হতে হবে। তবেই তারা তাদের মূল্য পাবে। তারই ফলশ্রুতিতে গত লোকসভা ভোটে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের রায় মমতা ব্যানার্জীর বিপক্ষে। আর মমতা ব্যানার্জীও বুঝে গেছেন মানুষের সাথে যে প্রতারনা তিনি এতোদিন করছিলেন মানুষ তা ধরে ফেলেছে। তাই তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এখন তাই ছুতোয় নাতায় জেহাদীদের ব্যবহার করে মানুষকে ভয় দেখাতে চাইছেন তিনি। আগামী দিনই উত্তর দেবে এই লড়াইতে কাদের জয় হবে। অশুভ জেহাদী শক্তির নাকি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের।

পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনা তত্ত্ব রাজনীতির কৌশল মাত্র

রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী

ছোট থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার তত্ত্ব শুনে বড় হয়েছি, আমাদের শাসক দলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতারা টলিপাড়ার ভাড়া করা এবং পেছনের দরজা দিয়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষক সমাজের একাংশকে বুদ্ধিজীবী সাজিয়ে আপামর বাঙালি জনসাধারণের মনে এই বঞ্চনার তত্ত্ব বপন করতে সফল হয়েছিলেন। এই সমস্ত মেরুদণ্ডহীন এবং ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবীর দল নিজেদের পকেট ভরানোর জন্য একসময় জ্যোতিবাবুর পা চেটেছেন, তারপরে বুদ্ধবাবু এবং যখন বাম পতনের শব্দের তীব্রতা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই গিরগিটির মত রং বদল করে "পরিবর্তন চাই" হোর্ডিং ফেলে তৃণজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন। লেনিন কিংবা স্ট্যালিন বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের এই সকল বুদ্ধিজীবীদের চরণ স্পর্শ করে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে বিপ্লব আসন্ন।

ভয়ঙ্কর সাইক্লোন আম্ফানের পরেই, কতিপয় বুদ্ধিজীবী আরো একবার বাঙালি ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে বঞ্চনা তত্ত্ব সামনে নিয়ে এলেন, ইংরেজি এবং হিন্দি সংবাদ মাধ্যমগুলি আম্ফানের তান্ডব নিয়ে সেভাবে কোন খবর দেখায়নি বলে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। পাড়ার ক্রিকেট খেলায় হেরে গেলে একদল যেরকম বলে ব্যাট-উইকেট রেখে দে, কালকে তোদের দেখে নেব, ঠিক সেইভাবেই বলে উঠলেন জাতীয় সংগীত রেখে দে আমরা নিজেরাই ঘুরে দাঁড়াব। আবেগপ্রবণ সাধারণ বাঙালি তাই দেখে উত্তেজিত হয়ে মরুঝড় ভুলে গিয়ে শচীন কেও লং-অনের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। সুযোগ বুঝে বঞ্চনার আগুনে ঘি ঢালার কাজে নেমে পড়লেন মেহনতী মানুষের দল। মোদির আসতে কেন চল্লিশ ঘন্টা সময় লাগল বা হিসেব করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল এক হাজার কোটি বড্ড কম। আমরা একা ঘুরে দাঁড়াবেই, এই মনোভাব দেখাতে গিয়ে লেজেগোবরে হয়ে যাওয়ার পরে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সেনার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানুষটিও অসহায় ভাবে তিনদিন পরে সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইলেন। এ যেন এক অভূতপূর্ব সময়, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সমস্ত বাঙালি এককভাবে লড়ছে। স্বয়ং মারাদোনা এই লড়াই প্রত্যক্ষ করতে পারলে বলতেন ছিয়াশির বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেআমার গোলটা সর্বকালের সেরা গোল নয়, সেরা গোলটা করল আম্ফানের পরে বাঙালি। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ কে? মোদী-শাহ তো আমাদের দলে, তাহলে? উত্তরটা হলো খুবই ভয়ঙ্কর, আমাদের প্রতিপক্ষ ভারতবর্ষ, অবাক হবেন না, ঠিকই শুনলেন।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, করোনা মহামারীর মধ্যেও এই ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত পূর্বাভাস থেকে শুরু করে তার তাণ্ডবলীলা সবকিছুই প্রত্যেকটি হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, তাই সংবাদ মাধ্যমের দিকে আঙ্গুল তোলা যুক্তিহীন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো মেনে, প্রধানমন্ত্রী নিজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এক হাজার কোটি টাকার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করেছেন এবং এই আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় টিম রাজ্য সরকারের সাথে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা করার পর যা সাহায্যের দরকার তা কেন্দ্রীয় সরকার করবে। এই ঝড়ে যে সমস্ত পরিবার তাদের স্বজন হারিয়েছেন তাদের জন্যেও আর্থিক সহায়তা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে গেছেন। এর আগে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে দেখেছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন রাজ্য সরকারের সাথে কথা না বলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনভাবেই রাজ্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, ঠিক সেই কারণেই রাজ্য সরকারের অনুরোধ না পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনা পশ্চিমবঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলায় আসতে পারেনি। রাজনৈতিক পরিবৃত্তের বাইরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের সাধ্যমত এগিয়ে এসেছে, বিদেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলা এবং উড়িষ্যার দুর্যোগ পাশে থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং প্রত্যাশামতোই ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ তাদের সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন. কলকাতার কথা বাদ দিলাম, দুই চব্বিশ পরগনা সহ বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাথায় ছাদ নেই, পানীয় জল নেই, কোন বস্ত্র নেই কিন্তু সেই সমস্ত কথা না ভেবে হঠাৎ করে

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু হল কেন ?

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় সত্তরের দশকের শেষ থেকে এই অপচেষ্টা চলছে সমান তালে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্যই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির শুরু থেকে শেষ অব্দি শুধুমাত্র সর্বনাশ হয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজীর আমলে গরিব মানুষদের জন্য বাড়ি তৈরীর উদ্দেশ্যে শুরু হয় "ইন্দিরা আবাস যোজনা"। ২০১৫ সাল থেকে এই প্রকল্পের নাম হয়েছে "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা" এবং সেই সঙ্গে প্রতি বাড়িতে শৌচাগার তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে অতিরিক্ত কুড়ি হাজার টাকা। ১৯৮৫ সাল থেকে আজ অব্দি প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার কেন্দ্র বিরোধিতা করে এই প্রকল্পের কতটা ফায়দা তুলতে পেরেছে ? যদিও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার "গীতাঞ্জলি" বা "আমার ঠিকানা" নামক কিছু গৃহ নির্মাণ প্রকল্প চালু করেছে কিন্তু তাতে কি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা ব্যবহার করা হয়? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের টাকা আমরা কিভাবে ব্যবহার করেছি, সেই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্র বিরোধিতা করে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির লাভ হচ্ছে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ কি পাচ্ছি? সারা ভারতের মানুষ যখন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫ লাখ টাকা অব্দি স্বাস্থ্যবীমা পাচ্ছেন তখন আমরা সেই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত কেন? প্রকৃতির তাণ্ডব কোন সরকারের পক্ষেই আটকানো সম্ভব নয় কিন্তু পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে আজ হয়তো আমাদের এতটা অসহায় অবস্থা হত না। আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশা প্রতিবছরই বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে, কিন্তু তাদের পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আমাদের থেকে হয়তো কিছুটা ভালো বলেই তাদের এতো করুণ পরিস্থিতি হয় না।

বঞ্চনা তত্ত্বের প্রবর্তকগণ রবি ঠাকুরের জাতীয় সংগীত কে স্মরণ করলেও, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম সহজে স্মরণ করেন না। স্বামীজী থেকে নেতাজী বা রাসবিহারী বসু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে প্রণাম করে গেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে ফাঁসিকাঠে যত জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বলিদান দিয়েছেন তার সিংহভাগ বাঙালি এবং তারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। বর্তমান বাঙালির দুর্ভাগ্য এটাই, যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার স্বার্থে আমাদের ইতিহাস বিভিন্নভাবে বিকৃত করে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। দেশভাগের যন্ত্রণা অবিভক্ত বাংলা এবং পাঞ্জাবের মানুষ যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল তা অন্য প্রদেশকে করতে হয়নি কিন্তু বর্তমান পাঞ্জাব তা মনে রাখলেও বাঙালিরা ''গ্রেটার কলকাতা কিলিং" ভুলে গেছে। তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা চলে বাঙালি একটি আত্মঘাতী জাতি।

সবশেষে বলে রাখা ভালো বর্তমানে এই বঞ্চনা তত্ত্বের প্রবর্তকদের প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক দল সমর্থন না করলেও, এর পেছনে লুকিয়ে আছে জটিল ভোটব্যাঙ্কের খেলা। যদিও বাঙালি সহজেই সবকিছু ভুলে যায়, ঠিক যেভাবে আমরা ভুলে গেছি মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু বা সাঁইবাড়ির মত গণহত্যা, ঠিক সেই ভাবেই আমরা ভুলে যাব করোনা বা আম্ফানের সময় সমস্ত বিরোধী নেতাকে কার্যত বোতল বন্দি করে রেখে রাজনীতি না করার একান্ত অনুরোধটা। বাংলার সাধারন মানুষকে বুঝতে হবে স্বাধীনতার প্রায় ৭৩ বছর পরে পশ্চিমবাংলার সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ এই রাজনৈতিক খেলাকে শেষ করে দেওয়ার। আশা করব এই কথাগুলো লেখার জন্য আমাকে কেউ "পরবাসী" বলে আক্রমণ করবে না, আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন প্রবাসী ভারতীয়, এবং আমার বাকস্বাধীনতা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার।